আলো পথ

এমএলই নিউজলেটার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪, ষষ্ঠ সংখ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন

পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা সংক্রান্ত চিত্র বিশ্লেষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানে করণীয় বিষয়ে জাবারাং কল্যাণ সমিতির আয়োজনে *Grassroots Voice the Situation of Primary Education in the Chittagong Hill Tracts* শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন ২১ অক্টোবর ২০১৪ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ শিং, এমপি। মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি'র সভাপতিত্বে আলোচনার শুরুতে উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন গবেষক ও জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা।

প্রধান অতিথি প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ শিং, এমপি বলেন, এই প্রতিবেদনে যেসব বিষয় উঠে এসেছে সেগুলোর সঙ্গে মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ একমত। এই প্রতিবেদনে যেসব সমস্যা সন্নিবেশন করা হয়েছে, সেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্র। এই প্রতিবেদনে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য যে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে সম্পৃক্ত করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি বলেন, আলোচনায় যেসব বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি বিষয়ে যেসব সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবভিত্তিক।

আলোচনা শেষে গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ শিং, এমপি।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নীতিগত অঙ্গীকার

এমএলই ফোরামের ৩০তম সভা

৮ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে এমএলই ফোরামের ৩০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের আহ্বায়ক ও শিশু একাডেমির চেয়ারপার্সন, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এমএলই ফোরামের অগ্রগতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন এনসিটিবি'র শিক্ষাক্রম শাখার সদস্য ড. সরকার আবদুল মান্নান। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে সরকার ইতোমধ্যেই নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমএলই ফোরামের প্রস্তাবনা অনুসারে ইতোমধ্যেই এমএলই উপকরণ প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত এমএলই কার্যক্রমের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নীতি নির্ধারণী পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় সুপারিশ উত্থাপন না করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তপন কুমার দাশের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্র্যাক, সেভ দ্য চিলড্রেন, এসআইএল-সহ উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সংস্থা কর্তৃক এমএলই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যাগসমূহ তুলে ধরেন। গোলাম মোস্তফা দুলাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ড. সৌরভ শিকদার এবং ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি এম. এইচ. মহিউদ্দিন কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফোরামকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান। আগা খান ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ড. গোলাম মোস্তফা উপর্যুক্ত লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক পর্যায়ে এডভোকেসি সভা আয়োজন ও লবিং করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সবশেষে চেয়ারপার্সনের বক্তব্যে সেলিনা হোসেন এমএলই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এনসিটিবিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আদিবাসী শিশুদের হাতে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বইপত্র তুলে দেওয়া আমাদের নীতিগত অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পাঠ্যপুস্তকে পাহাড়িদের সম্পর্কে তথ্য : ২

পঞ্চম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ধর্ম ও স্বদেশ প্রেম অধ্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি (পাহাড়ি বা সরকারি ভাষায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হতে পারত) বৌদ্ধরা অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য যে সকল ব্যক্তিদের নাম আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে কোনো পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ নেই। অথচ পাহাড়িদের মধ্যে ইউ কে চিং মারমা নামে বীরবিক্রম উপাধিপ্রাপ্ত এক বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন।

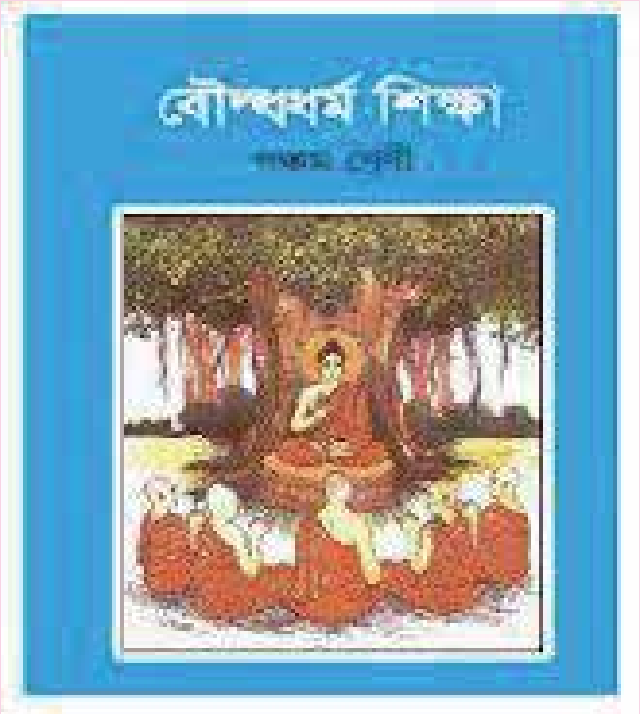

অপরদিকে, ৭ম শ্রেণির সপ্তবর্ণা বইয়ে এ কে শেরাম-এর 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' শীর্ষক প্রবন্ধে বানান ভুল নাকি লেখকের দুর্বলতা বোঝা মুশকিল। এরূপ কয়েকটি শব্দ হচ্ছে তুখি (গুথি), ভতদ্যা (ভাদ্যা), পাংপুজা (গাংপূজা), চুয়ানি (দো-চুয়ানি), মদপিলাল গছানো (মদপিলাং গঝানা) ইত্যাদি। এখানে কন্যার (কনের) জন্য দাবিকৃত বস্ত্র ও অলঙ্কারকে বলে 'বোয়ালি' কথাটির অর্থ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি। চাকমাদের মধ্যে কনেকে সাজানোর দায়িত্ব বরপক্ষের। কাজেই বস্ত্র ও অলঙ্কার দাবি করতে হয় না। তবে কনেকে সাজানোর জন্য যে সকল জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয় সেগুলোকে 'বোয়ালি জিনিস' বলা হয়ে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'ওঝা'-এটিও সঠিক নয়। ওঝা বিয়ের সময় শুধুমাত্র 'চুঙলাং' পূজাটিই সম্পাদন করে থাকেন। এখানে লেখক লিখেছেন- তারা (চাকমারা) আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং মৌজার প্রধান হলেন হেডম্যান। তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং রাজা কর্তৃক মনোনীত হন। এই তথ্যাদি একেবারে সত্য নয়, সাধারণত হেডম্যান পদটি উত্তরাধিকারমূলক পদ। হেডম্যানের ছেলে বা ছেলে না থাকলে ভাইয়েরা হেডম্যান পদে নিযুক্ত হয়ে থাকেন জেলা প্রশাসক সর্বোপরি সার্কেল চীফ দ্বারা। ৮ম শ্রেণির আলোচ্য অধ্যায়ে উপরে যে ছবিটিকে চাকমা নারী বলে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে ঐ নারী আসলে চাকমা নয়, তঞ্চঙ্গ্যা নারী। আলোচ্য অধ্যায়ে বোমাং সার্কেলে মারমা সমাজে প্রধান বোমাং চীফ বা বোমাং রাজার কথা উল্লেখ করা হলেও খাগড়াছড়িতে মারমাদের মং চীফ বা মং রাজার কথা উল্লেখ করা হয়নি। মারমা নারী বলে যে দলীয় ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে সে নারীরাও মারমা নারী নয়।

ষষ্ঠ শ্রেণির চারুপাঠ বইয়ে আনিসুজ্জামান লিখিত কতকাল ধরে শীর্ষক লেখাটি পড়ে বুঝে হোক বা না বুঝে হোক আমার ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া মেয়েটি যখন জিজ্ঞেস করে- বাবা, তাহলে আমরা কি নিচু স্তরের লোক, আমি কোনো সদুত্তর দিতে পারিনি। তবে সে যে মানসিক পীড়া অনুভব করেছে তা আমি বুঝেছি।

৪র্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ে দেশে মোট ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাসের কথা উল্লেখ করা হলেও শুধু ১০টি জাতিসত্তার তথ্য সংযোজনে বৈষম্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন- চাকমা বিষয়ে ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে, মারমা বিষয়ে ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে, সাঁওতাল বিষয়ে ৪র্থ, ৭ম, ও ৮ম শ্রেণিতে, গারো বিষয়ে ৫ম, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে, ত্রিপুরা বিষয়ে ৫ম ও ৭ম শ্রেণিতে, মণিপুরী বিষয়ে ৪র্থ ও ৭ম শ্রেণিতে নানা তথ্য সংযোজিত হয়েছে। এসব শ্রেণিতে ঘুরেফিরে একই তথ্য নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে- কোনো কোনো সময় বিকৃতভাবেও। একই জাতিসত্তা বিষয়ে তথ্য না দিয়ে দেশের অন্য জাতিসত্তা বিষয়ে তথ্য সংযোজন করা হলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আরো সমৃদ্ধ হতে পারত। উপরোক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্টত যে, পাঠ্যবইয়ে পাহাড়িদের বিষয়ে যে সকল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা মোটেই সম্মানজনকভাবে ও সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরিতে এ ধরনের লেখা কতটুকু ভূমিকা পালন করবে তাতে সন্দেহ রয়েছে। অধিকন্তু, দেশের বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী পাহাড়িদের জীবনবোধ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিয়ে বড় হবে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কাজেই বৃহত্তর স্বার্থে পাঠ্যবইয়ে উপস্থাপিত তথ্যাবলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনসহ যথাযথ তথ্য সংযোজন করার উদ্যোগ আশু গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

শুভ্র জ্যোতি চাকমা

বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা

১১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে নিজস্ব কনফারেন্স কক্ষে বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কিত এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) ড. অরুণা বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শীর্ষক একটি গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুচিন্তিত মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ এ প্রকল্পের গবেষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রকল্প পরিচালক ড. অরুণা বিশ্বাস প্রকল্পের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। প্রকল্পের পরামর্শক অধ্যাপক সৌরভ শিকদার গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি ব্যাখ্যা করেন। প্রকল্পের গবেষকগণ প্রকল্পের গবেষণা পদ্ধতি তুলে ধরেন। এ সংক্রান্ত উপস্থাপনা তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচির পরিচিতি তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় পর্বে ছিল নৃ-গোষ্ঠীর পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিতকরণ বিষয়ক আলোচনা। তৃতীয় পর্বে ছিল উন্মুক্ত আলোচনা ও সামগ্রিক আলোচনার সারসংক্ষেপকরণ।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল নৃ-গোষ্ঠীর সহায়তা কামনা করেন। প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সকলে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ গবেষণার ফলে বাংলাদেশের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার ইতিহাস গ্রন্থিত হবে।

আবু রেজা

অনিশ্চয়তায় আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের পাঁচটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

বাজেট প্রাপ্তিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রস্তুতিমূলক কাজে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতার কারণে এ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ছয়টি আদিবাসী জনগগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাঁওতাল ভাষার বর্ণমালা নিয়ে সমস্যা থাকায় বহুভাষিক শিক্ষাক্রম (এমএলই) পদ্ধতিতে পাঁচটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এবং সমতল অঞ্চলের গারো ও সাদ্রি ভাষা।

এমএলই পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য এমএলই নিয়ে গবেষণা, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, আদিবাসী শিশুদের পরিচিত জগতের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরির কথা এনসিটিবির। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদাপত্র ও কোথায় কোন আদিবাসীর বসবাস রয়েছে উল্লেখ করে জনমিতিক মানচিত্র তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিশুদের পাঠদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে কোনো সমন্বয় না থাকায় বাস্তবে এখনো কোনো কাজ হয়নি।

এনসিটিবির কর্মকর্তারা বলেছেন, এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য ৯৬ লাখ টাকা বাজেট চাওয়া হয়েছে। বাজেট অনুমোদন হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে তা এনসিটিবিতে এসে পৌঁছায়নি। এজন্য সব কাজ স্থবির হয়ে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে এনসিটিবির সমন্বয়হীনতা রয়েছে স্বীকার করে সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মকর্তা বলেন, পাঠ্যক্রম তৈরির দায়িত্ব এনসিটিবির হলেও এটি বাস্তবায়নের কাজ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। কিন্তু অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের চাহিদাপত্র প্রদান, প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকের তালিকা দেওয়া ও জনমিতিক মানচিত্র তৈরির কোনো ব্যাপারে এনসিটিবির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। এ অবস্থায় এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তকের কাজ ডিসেম্বরে শেষ করলেও জানুয়ারি থেকে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৪

শিক্ষাক্রমে আদিবাসীদের নিয়ে অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত হচ্ছে না আগামী বছর

তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশে বসবাসরত আদিবাসীদের জীবনধারা সম্পর্কে অষ্টম ও নবম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে অতিরিক্ত একটি বিষয় সংযোজন ২০১৫ সালে হচ্ছে না। 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' নামে অতিরিক্ত বিষয়ের ওপর প্রণীত খসড়া পাঠ্যবইয়ে মৌলিক কিছু ত্রুটি থাকায় ২০১৬ সালের আগে সংযোজন সম্ভব হচ্ছে না বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানান।

এনসিটিবির গবেষণা শাখার কর্মকর্তারা বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষ ২০১৪ থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আদিবাসীদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি নিয়ে অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে সংযোজন করার জন্য এনসিটিবি সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু যে লেখকদের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা কাজটি শেষ করলেও তাঁদের কাজে কিছু মৌলিক ত্রুটি রয়েছে। এজন্য এনসিটিবির বোর্ড সভায় তা অনুমোদন করা যায়নি।

শিক্ষার্থীদের কাছে আদিবাসীদের জীবন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য অতিরিক্ত বিষয়টি পাঠ্যক্রমে সংযোজন করা হচ্ছে বলে এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান।

এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতীশ কুমার সরকার বলেন, অতিরিক্ত বিষয়ে খসড়া পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া ত্রুটিগুলো কোনো সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ জন্য সেগুলো অনুমোদন করা সম্ভব হয়নি।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ২০১৫ সালের জন্য নতুন খসড়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাই ২০১৬ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ করা হচ্ছে।

বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, দৈনিক প্রথম আলো
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৪

আদিবাসীদের মাতৃভাষার বর্ণমালা প্রণয়নের উদ্দীপনা ও প্রাসঙ্গিক কথা

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। মনের ভাব প্রকাশে মা ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধ্বনি দিয়ে কথা বলার নামই ভাষা। মুখনিসৃত ধ্বনিগুলো একত্রিত হয়ে বাক্য বা কথায় রূপায়ণে যে কথপোকথন হয় তাকে বলে কথ্যভাষা। কথ্যভাষা লিখতে গিয়ে জাতিভিত্তিক নিজস্ব বর্ণে না লিখে অন্য কোনো বর্ণ দিয়ে লিখলে অনিবার্য কারণে শব্দার্থের বিকৃতি ঘটে। এভাবে অর্থ বিকৃতির কারণে এক সময় ভাষা হয়ে যায় জগাখিচুড়ি। তাই প্রত্যেক জাতির জন্য ভাষার সঙ্গে বর্ণমালা থাকা অতীব জরুরি। নিজস্ব ভাষার বর্ণমালা না থাকায় অনেক জাতি নিজেদের ভাষা অন্য বর্ণে লিখে ধ্বনির অর্থ পরিবর্তন হতে হতে এক সময় ভাষা হারিয়ে ফেলে। ভাষা হারানোর ফলে পৃথিবী থেকে অনেক জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জাতি সুরক্ষার জন্য ভাষা ও সংস্কৃতি লালন করা অত্যাবশ্যক।

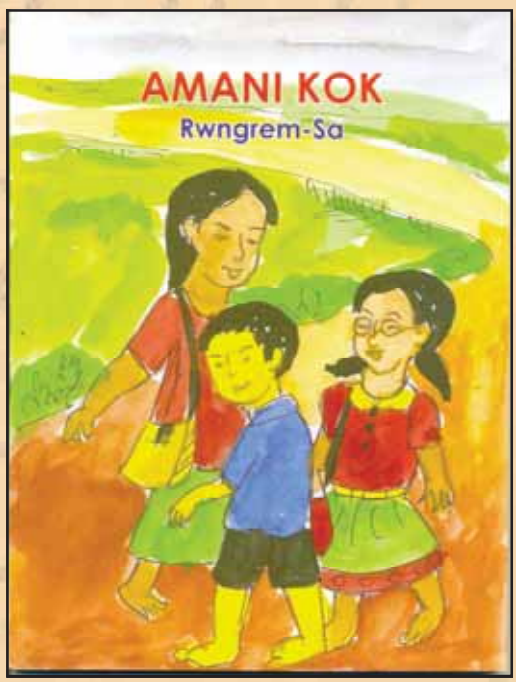

১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্যতম ধারা। জাতি সুরক্ষার জন্য এই ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। চুক্তির এই ধারার আলোকে সরকার কর্তৃক মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বিলম্ব ঘটলেও ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন এনজিও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিলে পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খিয়াং, ম্রো, বম, লুসাই, খুমি, পাংখোয়া, চাক, তঞ্চঙ্গ্যা ও উসুই এই ১২ ভাষাভাষী জাতির নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে পার্বত্য আদিবাসীদের মধ্যে স্ব স্ব ভাষার জন্য স্ব স্ব বর্ণমালা প্রণয়নের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের এটি একটি মৌলিক অর্জন।

সৃষ্টির আদিকাল হতে চাকমা জাতির ভাষার সঙ্গে বর্ণমালা বিদ্যমান। কিন্তু ভাষা শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় ৯০ ভাগ চাকমা নিজেদের বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত নন। অপরদিকে, বান্দরবানের মারমা ও কক্সবাজারের রাখাইন ভাষার কিছু মিল থাকার কারণে মিয়ানমার (বার্মা)সহ ভাষা লেখার কাজে ব্রাহ্মী অক্ষর ব্যবহার করে থাকেন এবং ৯০ ভাগ মারমা ও রাখাইন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখতে ও পড়তে পারদর্শী। পক্ষান্তরে, ত্রিপুরা জাতি তাদের ভাষার বর্ণমালা না থাকলেও নিজেদের ভাষা লেখার জন্য রোমান হরফ ব্যবহার করে ত্রিপুরা ভাষার বর্ণমালা করে নিয়েছেন। তঞ্চঙ্গ্যারা আদিকাল থেকে নিজেদের ভাষা লেখার কাজে চাকমা বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকলেও যুগের দাবিতে চাকমা ও ব্রাহ্মী বর্ণমালার কিছু কিছু বর্ণের অবস্থান ও আকৃতি পরিবর্তন করে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা তৈরি করে নিয়েছেন । সম্প্রতি চাক জাতি তাদের বর্ণমালা প্রণয়ন করেছেন বলে জানা যায়। যে সকল জাতির এখনো পর্যন্ত বর্ণমালা নেই, তারাও বর্ণমালা প্রণয়নের চেষ্টায় রয়েছেন। তবে লুসাই ও পাংখোয়া জাতি রোমান হরফে নিজেদের ভাষা লেখার কাজ চালিয়ে আসছেন।

ঐতিহ্যগতভাবে সকল জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য রয়েছে। চাকমা জাতির ইতিহাস, কিংবদন্তি, লোককাহিনি বাংলা বর্ণে লেখা হতো। পুরাকালে চাকমা বর্ণে লেখা আঘরতারা, বারমাসি, আলসি কবিতা, গোজেন লামা, কলি চোদিয়া ইত্যাদি চাকমা থেকে বাংলায় বর্ণান্তর করে লেখার ফলে মূল গ্রন্থের কথা ও কাহিনী অনেক বদলে গেছে। চাকমাগণের নিজেদের বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিতি না থাকায় বাংলায় লিখতে গিয়ে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই চাকমা শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা শিক্ষার জন্য ইতোমধ্যে আমা বই নামে শিশু শ্রেণি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং মূল চাকমা বই নামে প্রথম শ্রেণির উপযোগী দুটি পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া চাকমা বর্ণমালাগুলো কোন বর্ণ কোন অবস্থান থেকে কি কাজ করে তা' পর্যালোচনা করে 'চাকমা লেঘা আলাম' নামে একটি গবেষণামূলক পুস্তিকা প্রণীত হয়েছে। যা ভাষা লেখার জন্য বর্ণমালা ব্যবহারে অনুসরণযোগ্য।

যে কারোর জন্য চাকমা লেখা শেখার উপায় হিসেবে বাংলায় নির্দেশনা রেখে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বর ও ব্যঞ্জনচিহ্ন ও লেখার জন্য বানানরীতি এবং সঙ্গে চাকমা সংখ্যা দিয়ে শতকিয়া, নামতা, স্থানীয় মান, বারের নাম, মাসের নাম ও ষড়ঋতুর নাম ইত্যাদির সমাবেশে ঘরে বসে চাকমা লেখা শেখার কৌশল উদ্ভাবন করে ছোট আকারে 'চাঙমা পথম শিকখ্যা' নামে পাঠ্য উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। এটি হবে চাকমা লেখা শেখার সহজ পদ্ধতি।

প্রসন্ন কুমার চাকমা

সাঁওতাল ভাষা

বীরবান্টা কাঁড়া-গুজী

সেদার যুগরে মিতদিন মিতটেন কুঁড়িৎ অকা বুরু খন'চং হড় এলাকায় উডাউ হেয়চ এনা। আর মারাং দারেরেয় আপএনা। তুকীয় লাগিত হড়কোআক নাহেল, ইসি, আরাঁড়, আড়গম আর জম লাগিত মেরম, ভিডি মিহু হপন আর কাটিচ গিদ্‌রী কোয় হালো ইদিকেত কোআঃ। এলাকারেন হড় বতরতেকো কাউয়ী-রাউয়ী চাবায়েনা।

রাজাকে লাইআদেয়া, রাজা'য় ঘোষনা কেদা, নুই কুঁড়িৎ যাহায় গয়চ্ লেখান রাজকুমারী সাওঁএ বাপলা কায়া। আর মিত কেচাক্ দিশীম-এ হাটিঞ আয়া। নোয়া ঘোষনা আঞ্জমতে আডি শিকারিয়ী কুঁড়িৎকো তেরাং বাড়াকেদেয়া, মেনখান বাকো লেটেচ্ দাড়েয়াদেয়া।

কাঁড়া আর গুজা'দ বীরবান্টা কানাকিন। শিকারিয়ী হঁ তুখীড়গে, উনকিনাক্' আ'ক্‌দ মেঁডহেত রেয়াঃক্। আর অনা আ'ক্' রেয়াঃক্ ওজন তাকিন'দ বারো মন কাতে। আঃক্‌তে এংকাম সেংকান গাডা আড়েকাতে হাকোকিন গয়চকোআঃ। মুচাৎরে কাঁড়া আর গুজাকিন হেয়চয়েনা। রাজা'দ দিশীম রেনাক দুখ আর আয়াক কিরিয়ী কাথায় লাইআত কিনা।

উনরে কাঁড়া'দ গুজাই মেতাদেয়া, দো'শেয়া গুজী, নুই টিপি-টিড়িঞ কুঁড়িৎ'দ সুমার গল কায়মে। উনরে গুজা দয় মেনকেদা, বাং দাদা, ইঞ গঅচ্ লেখান রাজকুমারী'দ আমরেন বকম বাহুই হয়োক্'আ। দাঃক্' দাকা বাম কয় দাড়েআয়া। অনাতে আম গজেমে। ইনীখান রাজ কুমারী ইঞরেন হিলি'ই-হয়োক্'আঃ। দাঃ দাকাঞ কোয় দাড়েআয়া।

ইনাতায়ম কাড়াদ কুঁড়িৎ আঃ উমুলরেয় তেংগয়েনা। আড়ঁগম ফাঁক তেয়ে ঞেল ঞামোক্' কানা। লুতুর হুপী হীবিচ্ শার অর কাতেয় আড়াক্' কেদা। শার'দ আড়ঁগম ফাঁকতে পারম কাতে কুঁড়িৎ কড়ামরে জানকাও আদেয়া। কুঁড়িৎ'দ সলং কাতে ভের-ভের বীজিয়াতেয় ঞুরয়েনা। আর এ গয়চএনা।

দিশীম হড় আডিকো রীস্কীয়েনা। রাজা হঁ কাঁড়া সাঁও হপন এরায় বাপলা কাদেয়া আর মিৎকেচাক্' দিশীম-এ হীটিঞ আদেয়া। ইনা তায়ম কাঁড়ায়াক্' ঞুতুম'দ হোয়এনা চিল বিন্দা হাঁসদা আর গুজায়াক্ ঞুতুম'দ নিজ গুজা হাঁসদা।

অধ্যাপক গণেশ সরেন

বাংলা অনুবাদ

মহাবীর কাঁড়া ও গুজা

প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর ধারে পারামবার নামে এক দেশ ছিল। সে দেশে কিস্কু সম্প্রদায়ের এক মহান রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর প্রজারা খুব শান্তিতে বসবাস করত। হঠাৎ একদিন এক বিরাট ঈগল পাখি লোকালয়ে উড়ে এল। আশ্রয় নিল এক বড়ো গাছে। তারপর বাসা তৈরির জন্য মানুষের বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার থেকে লাঙলের ঈস, জোয়াল, মই ইত্যাদি নিয়ে যেতে লাগল। বাসা তৈরি হলে পাখিটি ছাগল, ভেড়া, শূকর, বাছুর এমনকী শিশুদের ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। পাখির হিংস্রতায় দেশের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হলো আতঙ্ক।

এ দুঃসংবাদ রাজাকে অবহিত করা হলো। রাজা তাঁর পরিষদ এবং দেশের চৌকষ ও শ্রেষ্ঠ শিকারিদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আলোচনা শেষে রাজা ঘোষণা দিলেন, যে এই ঈগল পাখিকে বধ করতে পারবে, তাকে রাজকন্যা ও রাজ্যের এক অংশ দান করা হবে। রাজার ঘোষণা শুনে অনেক দক্ষ শিকারি চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ পাখিটিকে মারতে পারল না।

তখন জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজাকে উপদেশ দিলেন, মহাবীর কাঁড়া ও গুজাকে নিয়ে আসার জন্য। তারা দুই ভাই। তাদের তীর-ধনুক লোহার তৈরি। প্রত্যেকের ধনুকের ওজন বারো মণ। সেই ধনুক দিয়ে ছোট ছোট নদীতে বাধ দিয়ে মাছ ধরা যায়। এ সময় তারা দূরে শিকারে গিয়েছিল। রাজা সিপাই পাঠিয়ে তাঁদের নিয়ে এসে সব ঘটনা বললেন।

কাঁড়া তখন গুজাকে বলল, যাও তো ছোট ভাই, এই ফুচকে ঈগলটিকে মেরে ফেল। তখন গুজা বলল, দাদা আমি ঈগলটিকে মারলে রাজকুমারী আমার বউ হবেন এবং আপনি তার ভাসুর হবেন। ফলে আপনি কিছুই চাইতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং আপনি ঈগলটিকে মারেন, রাজকুমারী আপনার বউ হলে, তিনি আমার বউদি হবেন। তখন আমি সবকিছু সহজে চেয়ে নিতে পারব।

কাঁড়া তখন তার তীর-ধনুক তুলে নিলেন। পাখির ছায়ায় দাঁড়ালেন, তারপর উপরে তাকালেন। মইয়ের ফাঁক দিয়ে ঈগলটিকে তাক করলেন। আকণ্ঠ গুন টেনে তীর ছুঁড়লেন। তীর মইয়ের ফাঁক দিয়ে উড়ে গিয়ে ঈগলের বুকে বিদ্ধ হলো। ঈগল ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ল। পা ও ডানা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঈগল মারা গেল। দেখা গেল ঈগলটি তার দেহ ও ডানা দিয়ে বার বিঘা জমি ঢেকে ফেলেছে।

দেশের মানুষ মহাখুশী। রাজকুমারীর সঙ্গে কাঁড়ার বিয়ে হলো এবং তাদেরকে রাজ্যের এক অংশ দেওয়া হলো। তখন কাঁড়ার নাম হলো চিল বিন্দা হাঁসদা আর গুজার নাম হলো নিজ গুজা হাঁসদা।

অনুবাদক : মারডি গণেশ মাঝি

দুর্গম পাহাড়ি জনপদ ত্রিপুরা পাড়ায় শিক্ষার আলো জ্বলছে যেমন করে

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি জনপদ ত্রিপুরা পাড়া। কমপক্ষে ৬/৭টি পাহাড় অতিক্রম করে ওখানে যেতে হয়। একটা ছড়া পার হয়ে পরের পাহাড়ে উঠতে হয়। WINROCK INTERNATIONAL-এর Climate Resilient Ecosystems and Livelihoods (CREL) প্রকল্প'র অধীনে কোডেক এখানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। প্রকল্পের অর্থায়ন করছে ইউএসএআইডি। এফআইভিডিবি কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। ত্রিপুরা পাড়ার এই ব্যবহারিক সাক্ষরতা কেন্দ্রটির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে বয়স্ক নারী-পুরুষ এক সঙ্গে লেখাপড়া করছে।

ক্রেল প্রকল্প'র দুধপুকুরিয়া, ধোপাছড়ি'র সাইট ম্যানেজার অসীম বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিনক্ষণ ঠিক করে ঢাকা থেকে যাত্রা করলাম। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বান্দরবান জেলার দুধপুকুরিয়া থেকে অসীম বড়ুয়ার মটর সাইকেলে যাত্রা করি ত্রিপুরা পাড়ার উদ্দেশ্যে। ৩টা পাহাড় অতিক্রম করার পর অসীম থেমে গেল। মটর সাইকেলে আর যাওয়া যাবে না। সহযাত্রী ক্রেল প্রকল্প'র লাইভলিহুড অর্গানাইজার ম্যালাচিং, ক্রেল প্রকল্প'র লাইভলিহুড অফিসার সাধন চাকমা, অসীম বড়ুয়া এবং আমি অতপর মটর সাইকেল গহীন অরণ্যে একটা লেবু বাগানে রেখে হাঁটা শুরু করলাম। পথ প্রদর্শক ম্যালাচিং বলল, সামনে আরও দুর্গম পাহাড়ি জনপদ। সরু পথে বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে আছে। গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে যেতে হবে।

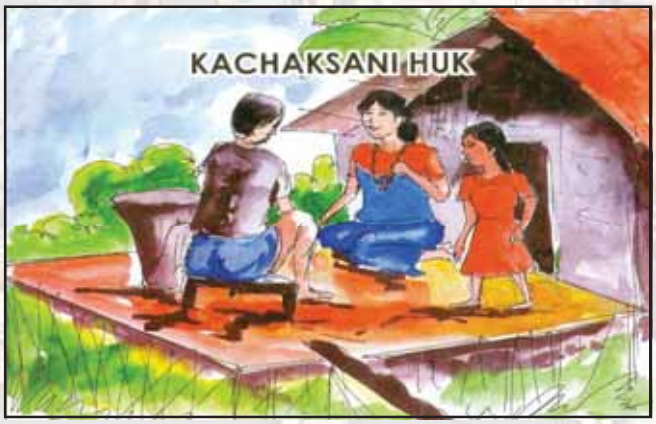

ম্যালাচিং'র বর্ণনার চাইতেও দুগর্ম আরও ৩/৪টি পাহাড় পেরিয়ে তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা পর অবশেষে ত্রিপুরা পাড়ায় যখন আমরা পৌঁছাই, তখন দুপুর দেড়টা। শিক্ষার্থীরা দুপুর ১২টা থেকে অপেক্ষা করছে।

এক সময় এই পাহাড়টির চারদিকে ১২০টি ত্রিপুরা পরিবার এসে বসতি স্থাপন করে। এ কারণে এর নাম হয়ে যায় ত্রিপুরা পাড়া। বর্তমানে এখানে ৬২টি ত্রিপুরা পরিবার আছে। রিজার্ভ ফরেস্টে এই পাড়াটি গড়ে উঠেছে। এটাকে বর্তমানে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান একটি টিউবয়েল বসিয়েছেন। ৬২ পরিবারের জন্য একটি টিউবয়েল। এখানে বিদ্যুৎ নেই, এখানে রাত হলেই আঁধার নামে। ত্রিপুরা গ্রামের লোকেরা বিকাল ৫টার মধ্যে নৈশাহার করে। দুপুর ১২টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করে। জুম চাষ তাদের পেশা। অভয়ারণ্য এবং রিজার্ভ ফরেস্টে জুম চাষ করা এখন আর সহজ না।

অন্তরমণি ত্রিপুরা এখানকার প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অন্তরমণি ত্রিপুরা আর এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারেননি। তিনি চিৎমরণ বৌদ্ধ বিহারে থেকে লেখাপড়া করেছেন। এখন দুর্গম এই পাহাড়ি জনপদে সাক্ষরতার আলো জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

অন্তরমণি ত্রিপুরা এখানকার সাক্ষরতা কেন্দ্রের সহায়ক। ত্রিপুরা পাড়ার ১৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী এ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী। তাঁরা নৈশাহার শেষ করে একটি মাচাং ঘরে একত্রিত হয়। এখানে তারা লেখাপড়া করে। অন্তরমণি তাঁদের পাঠ দান করেন। আমি জানতে চেয়েছিলাম, তারা কেন লেখাপড়া শিখছে? জবাবে বলল, আমরা তো বাংলা জানি না। হাট-বাজার যেখানে যাই, সবখানে বাংলা ভাষার ব্যবহার। বাংলা না জানার কারণে আমরা ঠকছি। আমি খেয়াল করলাম, আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি। কিন্তু আমার সব কথা বুঝছে না। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার পরও সকলে বুঝছে না। ২/১ জন যারা বুঝছেন, তাঁরা ত্রিপুরা ভাষায় বুঝিয়ে বলছেন। তারা বলল, আর্থিক সাক্ষরতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বইতে নানানরকমের কাজের কথা আছে। তা আমরা করতে পারছি না। নিজেদের মধ্যে আয় করার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না। কিছু করার জন্য হাত পা মিশমিশ করছে। ক্ষেত খামার করতে পারি না। গাছ, বাঁশ ধরতে পারি না। ফরেস্টের লোক এসে ধরে নিয়ে যায়। ঘর তৈরি করতে অনুমতি লাগে। ঘুষ দিলে সব করা যায়।

চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। ৬/৭টি গভীর অরণ্য পেরিয়ে লোকালয়ে যেতে হয়। কেউ অসুস্থ হলে ওঝা তাদের ভরসা। অন্তরমণি ত্রিপুরা এখানে কোডেকের সহায়তায় গর্ভবতী মায়েদের সেবার কাজ করছেন।

এখানকার শিশুদের সেভ দ্য চিলড্রেন পরিচালিত শিখন স্কুলের মাধ্যমে অন্তরমণি ত্রিপুরা লেখাপড়া শিখাচ্ছেন। এখানে ৩০জন শিশু লেখাপড়া করে। এর মধ্যে ছেলে ১৮ জন মেয়ে ১২ জন গত ২ বছর যাবৎ এরা এখানে লেখাপড়া শিখছে। অন্তরমণি ত্রিপুরার স্বপ্ন এরা একদিন এখান থেকে পড়ালেখা শেষ করে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। তিনি যেটা পারেননি ওরা তা করবে। দারিদ্র্য ওদের ঠেকাতে পারবে না।

সাক্ষরতা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা গান শোনাল। ত্রিপুরা গান। বুঝা গেল, এখানে ওরা লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে গান বাজনা করে। আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র আছে। ওরা আমাদের ডাবের পানি দিয়ে আপ্যায়ন করল। ত্রিপুরা পাড়াটি বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো। চারদিকে অরণ্য আর অরণ্য। এখানকার অরণ্যচারী মানুষগুলোর সমতলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা চলে যায়। এখানকার আদিবাসী মানুষগুলোর অদম্য ইচ্ছাশক্তি, বাধা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শপথ আর অন্তরমণি ত্রিপুরার সাক্ষরতার আলো ছড়ানোর প্রচেষ্টা আমাকে আশাবাদী করে।

কুমার প্রীতীশ বল

এস আই এল বাংলাদেশ - এর এম এল ই কার্যক্রম

কোল শিশু রোমান হরফে লেখাপড়া করছে

এস আই এল বাংলাদেশ মূলত একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এটা এস আই এল ইন্টারন্যাশনাল এর একটি শাখা। বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজন অনুধাবন করে ২০০৪ সালে সিলেটের কমলগঞ্জের শিববাজার ও তিলকপুরে প্রথম এমএলই (মাল্টিলিংগুয়াল এডুকেশন) বা মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা স্কুল শুরু করার মাধ্যমে এস আই এল বাংলাদেশ-এর এমএলই কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমানে সিলেটের কমলগঞ্জে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি এমএলই স্কুল আছে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় স্থানীয় সংস্থা মাসাউস-এর মাধ্যমে মাহ্‌লে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীকালে মাহলে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজস্ব পরিচালনায় দিনাজপুর জেলায় এর বিস্তার লাভ করে। তারপর ২০০৯ সাল থেকে রাজশাহী জেলার মোহনপুর ও চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলায় কোল ও কোডা জনগোষ্ঠীর মাঝে ২টি করে মোট ৪টি এমএলই স্কুল পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি থানায় কোচ জনগোষ্ঠীর জন্য ২টি এমএলই স্কুল পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা আরম্ভ করতে আগ্রহী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা আছে কি না সেই বিষয়টি সর্ব প্রথমে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যদি সেই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা না থাকে, তবে সেই জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই জনগোষ্ঠীর জন্য বানানরীতি তৈরি করা হয়। আর যদি সেই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা থাকে অথবা অন্য কোনো বর্ণমালা ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব বানানরীতি গড়ে উঠে তাহলে সেই জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সরাসারি পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। বানানরীতি তৈরি করতে কমপক্ষে ২টি কর্মশালার প্রয়োজন হয়।

এস আই এল বাংলাদেশ পরিচালিত এমএলই বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা পাঠ্যক্রম ও উপকরণ রয়েছে যা সেই জনগোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। এস আই এল-এর এমএলই প্রোগ্রামে এক বছর ও দু বছর মেয়াদি এই দুই ধরনের কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম রয়েছে। মাহ্‌লে ও মণিপুরী এমএলই কার্যক্রম এক বছর মেয়াদি যেখানে ৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে। কোল, কোডা ও কোচ জনগোষ্ঠীতে প্রি প্রাইমারি ১ ও প্রি প্রাইমারি ২ মিলে মোট দুই বছরের কারিকুলাম রয়েছে, প্রি প্রাইমারি - ১ এর জন্য ৪ বছর ও প্রি প্রাইমারি ২ এর জন্য ৫ বছর। এক বছর মেয়াদি পাঠ্যক্রমের উপকরণ তৈরির জন্য কমপক্ষে ৩টি এবং দুই বছর মেয়াদি পাঠ্যক্রমের জন্য কমপক্ষে ৪টি কর্মশালার প্রয়োজন হয়। চলমান এমএলই কার্যক্রমের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এস আই এল বাংলাদেশ ২০১৩ সালের শুরুতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঘোড়ামারা, তিলকপুর ও মাধবপুর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, উক্ত এলাকার মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরা যারা মাতৃভাষা স্কুলে পড়ালেখা করেছে তারা ক্লাশের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অনেক ভালো ফলাফল করছে। এছাড়াও তারা আরও বলেন যে, এই শিশুরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও সাবলীল। শ্রেণিকক্ষের মূলধারার শিক্ষার্থীদের তুলনায় সব কাজে তাদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি।

এস আই এল বাংলাদেশ কর্তৃক ওয়ার্কশপ সিরিজের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থাকে এম এল ই কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। এমএলই ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের জন্য অভিধান তৈরি করে। এছাড়াও সংস্থাটি ক্ষুদ্র ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাঝে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, শিখন চক্র, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এম এল ই কার্যক্রমে আগ্রহী জনগোষ্ঠী ও সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

আলপনা জয়ন্তি কুজুর
লীন সুমা অধিকারী

শহীদ রাশি মণি হাজং

'ময় তিমাদ, তিমাদ হুয়ে আরেগ তিমাদলা মান ময় বাঁচাব, মুরিবা লাগে মুরিব।' হাজং ভাষার এ বাক্যটির অর্থ হলো "আমি নারী, নারী হয়ে আরেক নারীর সম্ভ্রম রক্ষা আমিই করব, মরতে হয় মরব। কথাগুলো বলেছিলেন বিপ্লবী নারী রাশি মণি হাজং ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি। তাঁর আত্মবিসর্জনে সেদিন রক্ষা পান কুমুদিনী হাজং।

রাশি মণি হাজংয়ের জন্ম তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলাধীন বগাঝরা নামক গ্রামে ১৯০৮ সালে। সে সময় এ গ্রামটি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী গ্রামগুলোর মধ্যে একটি। রাশি মণি হাজংয়ের মনেও শুরু থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা গড়ে ওঠে। মহাজন ও জোতদারদের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখেন। এক সময় হয়ে ওঠেন টঙ্ক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী।

টঙ্ক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কৃষক আন্দোলন। টঙ্ক মানে ধান কড়ারি খাজনা। টঙ্ক প্রথার শর্তানুসারে জমিতে ফসল হোক বা না হোক চুক্তি অনুযায়ী টঙ্কের ধান জমির মালিককে দিতেই হতো। ফলে দেখা যায়, কোনো বছর যদি জমিতে ফসল না হয় বা খরা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য নষ্ট হয়ে যায়, তবুও কৃষককে তার নির্ধারিত খাজনা পরিশোধ করতে হতো। এতে হাজংসহ অন্যান্য সম্প্রদায় এবং অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় পড়ে। আর কোনো কারণে টঙ্কের ধান পরিশোধ করতে না পারলেই কৃষকদের ওপর নেমে আসে অত্যাচার-নিপীড়ন।

টঙ্ক প্রথা কৃষকদের জন্য ছিল অভিশাপ। তারা টঙ্কের হাত থেকে মুক্তির জন্য সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ বা আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রথমে টঙ্কের কুফল বিষয়ে গ্রামে গ্রামে বৈঠক করা হয়। পরে ঐকমত্য সৃষ্টি হলে কৃষকরা জমিদারদের টঙ্ক ধান দেয়া বন্ধ করে দেয়। এতে টঙ্ক চাষীদের ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ দেখা দেয়। কেননা জমিদারগোষ্ঠী টঙ্ক ধান আদায়ের জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করে। মূলত হাজং কৃষকগণই টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে তাদের জমিদার গোষ্ঠীর সঙ্গে অতঃপর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এবং শেষে পাক সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তারা। হাজংদের এ টঙ্ক ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড মণি সিং। যদিও বলা হয় ১৯৩৮ সাল থেকে টঙ্ক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার বহু পূর্বেই আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল এবং হাজংদের মাঝে সেটা কাজ করছিল।

রাশি মণি হাজংয়ের নেতৃত্বে নেত্রকোণার প্রতিটি অঞ্চলে যখন আন্দোলন তুঙ্গে, সে সময় ১৯৪৬ সালের ১ জানুয়ারি দুর্গাপুরের বিরিশিরিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এ সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে বিদ্রোহী হাজং কৃষকসহ অন্য কৃষকদের খুঁজতে শুরু করে। সে লক্ষ্যই ৩১ জানুয়ারি সকাল ১০টার দিকে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্স বাহিনী বিরিশিরি থেকে চার মাইল উত্তরে বহেরাতলী গ্রামে তলাশি চালায়। কিন্তু এ দিনে এ গ্রামের বিদ্রোহী কৃষক নর-নারীরা প্রতিবেশীদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার কাজে অন্য গ্রামে চলে গিয়েছিল।

অবশেষে এ গ্রামে কাউকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত পুলিশ বাহিনী লঙ্কেশ্বর হাজংয়ের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী কুমুদিনী হাজংকে ধরে নিয়ে বিরিশিরি ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়। হাজং গ্রামগুলোতে এ সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লে শতাধিক হাজং নারী-পুরুষ সশস্ত্র বাহিনীর পথ রোধ করে। এ সময় বিপ্লবী রাশি মণি হাজং তার দলবলসহ কুমুদিনী হাজংকে বাঁচাতে পুলিশ বাহিনীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ বাহিনীও

শহীদ হাজংমাতা রাশি মণি স্মৃতিসৌধ

নৃশংসভাবে গুলি চালায়। ফলে এক সময় পেছন থেকে আসা গুলিতে রাশি মণি হাজং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পেছনে পুরুষ দলের নেতা সুরেন্দ্র হাজং রাশি মণিকে ধরতে গেলে তাকেও নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে অন্য হাজংরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। ক্ষিপ্ত হাজং পুরুষদের বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলেই ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার বাহিনীর দুজন পুলিশ নিহত হয়। অন্যরা কুমুদিনী হাজংকে ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

নারী হয়ে নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে জীবন দিয়ে রাশি মণি আজ হাজংদের কাছে হাজংমাতা হিসেবে পরিচিত। তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে দীর্ঘ ৫৮ বছর পর বিভিন্ন গুণীজনের উদ্যোগে ২০০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি বহেরাতলী গ্রামে তাঁর মৃত্যু সংলগ্ন স্থানে নির্মিত হয়েছে 'শহীদ হাজংমাতা রাশি মণি স্মৃতিসৌধ'। এটি হাজং বিদ্রোহের অন্যতম সাক্ষী হিসেবে পরিচয় বহন করছে। হাজংরা তাই প্রতি বছর এ দিনটি আসলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করে থাকে।

সোহেল হাজং

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত **গণসাক্ষরতা অভিযান** - এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

European Union

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org

গণসাক্ষরতা অভিযান CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION